ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ॥ সংখ্যা ১০৬ ও ১০৭ (যুক্ত), ডিসেম্বর ২০২৫
ISSN : 2411-9059, e-ISSN: 3006-3078 DOI : http://dx.doi.org/10.62296/DVP/10607/007

তিন প্রজন্মের ছেদবিন্দুতে জীবননাট্যের অ্যানাগনোরিসিস: 'অগ্রজ পথিক' জামিল আহমেদের 'অগ্রিয় পথিকৃৎ' জিয়া হায়দার পাঠ আমার পুনঃপাঠ

শাহমান মৈশান*

Abstract: Zia Haider is one of the pioneering figures in the theatrical culture of Bangladesh, as he has penned powerful plays in Bangla, translated and adapted plays from many foreign languages, and historicised the evolution and growth of world theatre in the Bangal language as well. In addition to these, he has pioneered theatrical education in the sphere of public universities in the country. On the other hand, Syed Jamil Ahmed, the next generation of Zia Haider, is also a polymath who has left a significant mark on the field of scholastic studies of theatre and performance, creating theatre with unique and innovative idioms and educating pupils with a huge influence. Jamil Ahmed has recently critically revisited Zia Haider's oeuvre, while I, as a theatre pedagogue and creator belonging to the third generation, reevaluate my reading of the latter. This essay, therefore, aims to understand the cultural semiotics of Zia Haider's literary works through critiquing Jamil Ahmed's reading. As a result, this essay employs the hermeneutic method of reading the text to demystify the textuality. This research re-intersects the complex meeting point of intellectual reception of imaginative creation. This paper substantiates the necessity of critical engagement to reinforce the demand that any society requires critical inheritance to shape its internal world with the vibration of knowledge that validates the freedom of expression as well as the epistemic cultural significance of the difference in expression of opinion.

মুখ্যশব্দ: অ্যানাগনোরিদিম, জামিল আহমেদ, জিয়া হায়দার

ভূমিকা

"বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী" জিয়া হায়দার একাধারে "কবি, নাট্যকার, অনুবাদক, নাট্যতত্ত্ববিদ, শিক্ষক, সংগঠক, সর্বোপরি বিশ্বনাটকের সর্বজন অভিনন্দিত কৃতী ঐতিহাসিক"

* সহযোগী অধ্যাপক, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(হায়দার "সম্পাদকীয়")। জিয়া হায়দারকে অভিলক্ষ্য করে এই আলোচনা, বস্তুত, বাংলাদেশের নাট্যভুবনের তিন প্রজন্মেও একটি পরিভ্রমণকে, অ্যারিস্টটনিল অর্থে, "অ্যানাগনোরিসিস" (উদ্‌ঘাটন বা আবিষ্কার) করতে কৌতূহলী। প্রথম প্রজন্ম জিয়া হায়দার। দ্বিতীয় প্রজন্ম সৈয়দ জামিল আহমেদ– কিংবদন্তী নাট্য গবেষক ও নির্মাতা। তৃতীয় প্রজন্ম আমি শাহমান মৈশান– এই প্রবন্ধের রচয়িতা– পূর্বোক্ত দুই প্রজন্মের কর্ম-কৃতীর এক পাঠক। এই লেখা পূর্ববর্তী সৃষ্টিশীল ও চিন্তাশীল লেখালেখিকে সমালোচনামূলকভাবে ফিরে দেখার কাজকে "পাঠ" হিসেবে সাব্যস্ত করে। ফলে, পূর্ববর্তী কাজ পাঠ করার অর্থ হলো "ক্রিটিক্যাল থিংকিং" বা সমালোচনামূলক চিন্তা উৎপাদনের কাজ। এই কাজ যিনি করেন তিনি-ই "পাঠক।" এর মানে হলো যে লেখক, সে বস্তুত পাঠক মাত্র। তাই তিন প্রজন্মের সম্বন্ধ-সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় হোর্হে লুই বোর্হেসের এই উক্তির মধ্যে– "every writer creates his own precursors." প্রত্যেক লেখক যেন তাঁর আগের লেখককেই লিখে চলেন। অর্থাৎ, "all intellectual history is post factum"(Burke, 1998, p. 9). বুদ্ধিবৃত্তির ইতিহাসে পরের ঘটনা এর আগের ঘটনার ক্রম-ফল মাত্র। এই চিন্তার সূত্রে এই আলোচনা অগ্রসর হতে চাইবে এবং অ্যাকাডেমিক রচনায় নৈর্ব্যক্তিক থাকার অধিপতিশীল প্রথাকে প্রায় প্রশ্নবিদ্ধ করতে আগ্রহী থাকবে। কেননা মিশেল ফুকো প্রণীত ডিসকোর্স ধারণা আমাদেরকে অবহিত করে যে, জ্ঞান ও ক্ষমতার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ভেজাল নিরপেক্ষতার ধারণা বজায় রাখার সম্ভাবনাকেই অসম্ভব করে তোলে। তাই এই লেখায়, জ্ঞান উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে নৈর্ব্যক্তিক সত্য রূপে যেহেতু গণ্য করা হয়নি সেহেতু, "আমি"রূপী এক কর্তা প্রায় স্বনামে হাজির থাকবে। অধিকন্তু, ভাষা যেহেতু ভাবাদর্শিক ক্ষমতা-সম্পর্কের মধ্যে ক্রিয়াশীল থেকে এক রাজনৈতিক চিহ্ন-ব্যবস্থা উৎপাদনের মাধ্যমে রচনার নৈর্ব্যক্তিকতাকে শুধু প্রশ্নবিদ্ধই করে না, একই সঙ্গে, তা পাশ্চাত্য আধুনিকতাবাদের আওতায় গড়ে ওঠা পজিটিভিস্ট না প্রত্যক্ষাণবাদী নৈর্ব্যক্তিকতার পদ্ধতিকে, জ্ঞান উৎপাদনের এই বিদ্যায়তনিক প্রক্রিয়ায়, লেখকের পক্ষপাতহীন থাকার মনোভঙ্গিকে ছদ্মবেশ বলে নাকচও করে। তাই, এই লেখায়, লেখকের "সাবজেক্টিভ এজেন্সি" বা ব্যক্তিক কর্তসত্ত্বারূপী আমিময়তা সজ্ঞানে সর্বদা প্রকাশ্য থাকতে আগ্রহী।

জিয়া হায়দারের নাট্যকর্ম নিয়ে সৈয়দ জামিল আহমেদ একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণালব্ধ পাঠ রচনা করেছেন। জিয়া হায়দার নিয়ে জামিল আহমেদের বিস্তৃত-গভীর পাঠ পলেমিক্স বা তর্কশাস্ত্র অনুসরণে পুনঃপাঠ করে এই লেখায় আমি আমার নতুন বক্তব্য পেশ করতে চাই। আরও চাই, বাংলাদেশে নাট্যশিল্প ও বিদ্যাচর্চার দুই মনীষী প্রয়াত জিয়া হায়দার এবং জীবন-উদ্‌যাপনে সক্রিয় সৈয়দ জামিল আহমেদকে তাঁদের প্রাতঃস্মরণীয় কাজের জন্য শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে। এখানে আমি মনে করতে চাই, হাইনার মুলারের সেই উক্তি, বার্টল্ট ব্রেশ্‌টকে শ্রদ্ধা জানাবার একমাত্র উপায় হলো তাঁকে সমালোচনা করা। জামিল আহমেদও জিয়া হায়দারকে সমালোচনা করেই শ্রদ্ধা করেছেন। আমিও জামিল আহমেদকে সমালোচনা করেই শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন

করতে চাই। বর্তমানে, আমাদের সমাজ ব্যক্তিগত বিদ্বেষ আর চিন্তার চর্চার মধ্যকার পার্থক্য গুলিয়ে ফেলেছে। কিন্তু, আমার আলোচনা এর বিপরীতে অবস্থান করবে এবং একাত্মবোধ করবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বর্ণিত বৌদ্ধ যুগ থেকে প্রচলিত বাংলা অঞ্চলের স্থানীয় জ্ঞানতত্ত্ব বা বিচারপ্রণালীর সঙ্গে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বর্ণিত সেই বিচার প্রণালীতে দেখা যায় "... একটা কথা উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে অনেক ফেকড়ী উঠিল, সব ফেকড়ী উদ্ধার করিয়া তবে মূলকথার বিচার হইল। [অর্থাৎ] ১. সন্দেহ ২. বিষয়। তাহার পর পূর্বপক্ষ, তাহার পর উত্তর। তাহার পর নির্ণয়" (শাহমান, ২০২২, পৃ. ১২৬–১২৭)।

এই লেখার মূল গর্ভে প্রবেশের আগে, আরও একটি ডিসক্লেইমার দিতে চাই। জিয়া হায়দার নিয়ে জামিল আহমেদের পাঠ আমি পুনঃপাঠ করতে আগ্রহী হয়েছি স্বয়ং কার্ল মার্ক্স থেকে শিক্ষা নিয়ে। মার্কস যেমন *জার্মান আইডিওলজি* বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে, পূর্বসূরি ইয়ং হেগেলিয়ান লুডভিগ ফয়েরবাখ নিয়ে লিখছেন Eleven Theses on Feuerbach (Marx & Engels, 1846/1947), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বর্ণিত প্রাচীন বাংলার তর্কশাস্ত্র বা বিচারপ্রণালীর সঙ্গে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের ক্রিটিকাল থিংকিং চর্চায় একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তা হলো ক্রিটিককে ক্রিটিক করার অনুশীলন। এই অনুশীলন থেকে শিক্ষা নিয়েই আমি এই পর্যালোচনায় অগ্রসর হতে চাই।

অতএব, এই আলোচনারূপী বাহাসের উৎস হলো সৈয়দ জামিল আহমেদ রচিত প্রবন্ধ 'জিয়া হায়দার: অগ্রজ পথিক, অগ্রিয় পথিকৃৎ'। ২০২০ সালে ঢাকার নালন্দা প্রকাশনী থেকে দুই খণ্ডে মুদ্রিত জিয়া হায়দারের নাটকসমগ্রের ভূমিকা হিসেবে জামিল আহমেদ লিখেছেন এই প্রবন্ধ। জামিল আহমেদ তাঁর 'কৈশোর-উত্তীর্ণ যৌবনের সেই জিয়া ভাইকে' দেখেছেন 'পরবর্তী জীবনের অধ্যাপক, নাট্যকার ও নির্দেশক জিয়া হায়দার রূপে। জামিল আহমেদ (২০২০) তাঁর সেই জিয়া ভাইয়ের 'বিক্ষিপ্ত এবং অগণিত স্মৃতি' ও 'স্নেহ' পেরিয়ে পাঠ করতে গিয়ে বলছেন:

> ঠিক এই মুহূর্তে আমার সামনে তাঁর নাট্যরচনা সমগ্র। দুটি ক্ষুদ্রকায় নাট্যসহ সাতটি মৌলিক কর্ম, চারটি রূপান্তর এবং চারটি অনুবাদ দ্বারা গঠিত জিয়া হায়দারের এই সোনার তরীটির পাতা উল্টিয়ে এমন উপলব্ধি আমাকে অশান্ত করে যে, নাট্যকার মানুষটি ছিলেন নির্জন এবং অবহেলিত। ব্যক্তিরূপে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পাইনি বিধায় তাঁর নির্জনতা অতিক্রম করা আমার পক্ষে ছিল দুঃসাধ্য কর্ম। তবে আমি জিয়া হায়দারের নাট্যকর্ম পুনর্পাঠ [করতে] সক্ষম। এই পুনর্পাঠে নির্মোহ হতে চাই (পৃ. ১১)।

জিয়া হায়দারের সৃষ্টিকর্ম পাঠ করার পূর্বে জামিল আহমেদ মহাভারত থেকে গুরু-শিষ্য পরম্পরা সম্পর্কের একটি মেটাফর উল্লেখ করে নিজে নির্মোহ থাকার ওয়াদা করে বলেন:

> কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ-পূর্বে অর্জুন যেমন তাঁর গুরু দ্রোণাচার্যের পদসম্মুখে তীর নিক্ষেপ করে প্রণাম জানিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন সমানে সমান, এক বিন্দু ছাড় না দিয়ে, সেই আদর্শ সামনে রেখে আমি পুনপাঠে ব্রতী। অতএব, প্রথমে প্রণতি জানাই, জিয়া হায়দার; আগমন ১৯৩৬, বিদায় ২০০৮। অগ্রজ পথিক তুমি, অগ্রিয় পথিকৃৎ। তুমি ছিলে বলেই আমি আছি। অতঃপর, এই গবেষণালব্ধ নির্মোহ পাঠ। (পৃ. ১১)।

জিয়া হায়দারের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে জামিল আহমেদের 'এই গবেষণালব্ধ নির্মোহ পাঠ' পুনর্পাঠ করতে গিয়ে আমিও সেলাম জানাই, সৈয়দ জামিল আহমেদ, অগ্রজ পথিক আপনি, অগ্রিয় পথিকৃৎ– এক স্বপ্নদ্রষ্টা শিক্ষক, ভাষা বদলে দেওয়া এক তুঙ্গস্পর্শী নাট্যসৃজক, রাজনৈতিক দুঃশাসনের ইতিহাস পীড়িত এই উদিত দুঃখের দেশে আমাদের সাংস্কৃতিক অচিনপাখির তত্ত্বতালাশ করেছেন আপনি। আপনি এভাবে পথ হেঁটেছেন বলেই আমি আজ এই সন্ধ্যার গোধূলিতে লক্ষ করছি নাট্যের শিব-স্বর্ণরেণু। শ্রদ্ধাস্পদ জিয়া হায়দার ও সৈয়দ জামিল আহমেদ! আপনারা থাকেন বলেই আমরাও থাকতে পারি। এক্ষণে, শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালোবাসার অর্ঘ্য নিবেদন শেষে, এই আলোচনার ভূমিকা শেষ করার পূর্বে, প্রথমেই আমার একটি ডিনায়াল বা রিফিউজাল বা অগ্রাহ্যতা তুলে ধরতে চাই।

একটি বিশেষ অগ্রাহ্যতা

জিয়া হায়দারকে পাঠ করার জন্য সৈয়দ জামিল আহমেদ অর্জুন-দ্রোণাচার্যের যুদ্ধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শ্রদ্ধার মিশেলে একটি মেটাফর উল্লেখ করেছেন। এই মেটাফর উল্লেখের মাধ্যমে জামিল আহমেদ "ক্রিটিকাল থিংকিং" দিয়ে গঠিত "ডিসকার্সিভ" রচনার একটি ভাবাদর্শগত পদ্ধতি প্রস্তাব করেন। এই ভাবাদর্শিক পদ্ধতির অর্থ হলো আমি জামিল আহমেদ মহাভারতে উল্লেখিত সেই অর্জুন। আর আপনি জিয়া হায়দার পুরাণ কথিত সেই দ্রোণাচার্য। আমি অর্জুনরূপী জামিল অস্ত্রশিক্ষা লাভ করেছি আপনি দ্রোণাচার্য জিয়া ভাইয়ের কাছ থেকে। এর জন্য আপনাকে কদমবুচি করে গুরুদক্ষিণা দিচ্ছি। তবে আপনাকে যখন পাঠ করবো অর্থাৎ আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করব তখন প্রয়োজনে আপনার অভিমুখে তীর ছুঁড়তে দ্বিধা করবো না। অর্থাৎ জামিল আহমেদ সচেতন মনে বলছেন জিয়া হায়দারের রচনাবলী পাঠের ক্ষেত্রে শ্রদ্ধা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখবেন। কিন্তু অচেতন মনে তিনি জিয়া হায়দারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও অনুভব করেছেন।

আমার এই সিদ্ধান্তের মূলে যুক্তি হলো পোস্ট-স্ট্রাকচারাল সাইকোঅ্যানালিসিস বা কাঠামোত্তরবাদী মনোসমীক্ষণের সাম্প্রতিক চিন্তাধারা। সাইকোঅ্যানালিটিক ডিসকোর্স থেকে আমরা জানতে পারি টেক্সট হলো মন। কারণ, অবচেতন মন ভাষার মধ্যেই সারাক্ষণ ক্রিয়াশীল থাকে। যেমন জ্যাক দেরিদা বলেন, "writing is unthinkable without repression" অর্থাৎ অবদমন ব্যতীত লেখা অচিন্তনীয়। অবদমন না করে কোনো লেখা সম্ভব নয় বলেই

দেরীদিয় চিন্তা জানায়–"Writing at once represses and reveals desire" (Wright, 1998, p. 120) (লেখার মধ্যে লেখকের ইচ্ছা যেমন অবদমিত হয় তেমন উন্মোচিতও হয়। এই সূত্রেই মনে প্রশ্ন জাগে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা যদি অনুভব না-ই করতেন তবে কেন তিনি যুদ্ধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শ্রদ্ধার মিশেলে অর্জুন-দ্রোণাচার্যের এই মেটাফর উল্লেখ করেলেন? অন্যদিকে, আমার মতন এমন বহুজনের থেকেও জামিল আহমেদ অতি উত্তমরূপেই জানেন যে, অ্যাকাডেমিক রচনার ক্ষেত্রে রচয়িতা নিরপেক্ষতা বজায় রাখবেন। এটাই রীতিসম্মত, পালনীয়, বিধেয়। যদি তাই হয়, তবে এক্ষেত্রে, নিরপেক্ষ থাকার অঙ্গীকার কি বাহুল্য নয়? তাছাড়া, এই অঞ্চলের এক যুগন্ধর নাট্যপণ্ডিত সৈয়দ জামিল আহমেদ কি কোনো রচনার পাঠক্রিয়াকে এন্টাগনিস্টিক অ্যাক্ট বা টেক্সটের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ানোর প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক কাজ বলে মনে করেন?

প্রস্তাব

এই অগ্রাহ্যতার সূত্রে আমার প্রথম প্রস্তাব হলো, একটি লেখা বা শিল্পকর্ম নির্মোহ বা নিরপেক্ষ অভিব্যক্তি নয়। রচনা সর্বদা ভাষ্যবাহিত সামাজিক রাজনৈতিক ভাবাদর্শিক ও অবচেতন মনের নিয়ন্ত্রণসহ নানা শর্তের ফলাফল। অতএব, জামিল আহমেদ জিয়া হায়দারের রচনাকর্ম নিয়ে যে নির্মোহ পাঠের অঙ্গীকার ও দাবি করেছেন তা ভাষার নিয়মেই মোহযুক্ত হতে বাধ্য। ভাষার সঙ্গে ভাষা ব্যবহারকারী ব্যক্তির সম্পর্ক কী? এই প্রশ্নসূত্রে, ফরাসি কবি স্টিফেন মালার্মের চিন্তা দিয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে ফরাসি কাঠামোত্তরবাদী দার্শনিক রোলাঁ ব্যর্থ বলেন, it is language which speaks, not the author..." (Burke, 1998, p. 208). ভাষার রচয়িতা নন, ভাষা নিজেই কথা বলে। লেখক নন, লেখকের লেখা-ই কথা বলে। ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকো *The Order of Things: An Archaeology of the human Sciences* বইয়ে পূর্বসূরি জার্মান দার্শনিক ফ্রেডরিখ নিৎশে'র আদলে প্রশ্ন উত্থাপন করেন: who is speaking কে কথা কয়? এর উত্তর খুঁজেন মালার্মের নিকট: 'what is speaking is, in its solitude, in its fragile vibration, in its nothingness, the word itself (Foucault, 1970, p. 305) নির্জনতায়, নাজুক কম্পনে, শূন্যতায় যা কথা বলে তা হলো স্বয়ং শব্দ।

অনুরূপভাবে, ফরাসি নৃতাত্ত্বিক ক্লদ লেভি-স্ট্রসও মনে করেন ব্যক্তির সঙ্গে জ্ঞানের সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দার্শনিক ও নৃবৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বর্তমান ধারা সচেতন আলামত উপেক্ষা করে বরং অবচেতন মনের অবকাঠামো অধ্যয়নের দিকে মনোনিবেশ করে। ভাষা ও মনের দার্শনিক জ্যাক লাকাও জোর দিয়ে বলেন, 'it is not man as conscious subject who thinks, acts or speaks, but the linguistic unconscious that determines his every thought, action and utterance (Burke, 1998, p. 13)। ভাষায় বিধৃত অবচেতন মন যদি হয় মানুষের প্রতিটি চিন্তা, আচরণ ও উচ্চারণের নির্ণায়ক, তবে, আমরা

আগেই বলেছি, ভাষা নিজেই নানা ভাবাদর্শ ও ক্ষমতাসম্পর্কের বহু চিহ্নে ঠাসা থাকে। ভাষা যেহেতু আবার সামাজিক উৎপাদন, সেহেতু জিয়া হায়দারের ভাষা নিয়ে জামিল আহমেদের ভাষা আর সেই ভাষা নিয়ে আমার বাহাসে ভাষা কোনোকিছুই নির্মোহ বা নিরপেক্ষ নয়। বরং অনুসন্ধানযোগ্য হতে পারে জিয়া হায়দারের নাটকের ভাষায় বিধৃত যৌথ অবচেতন মন কী অর্থে হাজির আছে আর সেই অর্থ জামিল আহমেদের আলোচিত রচনায় কী অর্থে ব্যক্ত আছে তা জানা। তাই, আমার মূল আগ্রহ হলো জামিল আহমেদের অনুসন্ধান পাঠ করে সেই পাঠার্থ অপরাপর পাঠকের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেওয়া।

জামিল আহমেদের জিয়া হায়দার পাঠের পদ্ধতিগত রূপরেখা

জামিল আহমেদের অনুসন্ধান এবং দুই খণ্ডে প্রকাশিত রচনাসমগ্র পাঠ করে আমরা জানতে পারছি জিয়া হায়দার সাকুল্যে ১৫টি নাটক রচনা করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, জামিল আহমেদ ঔপনিবেশিক আমলে প্রচলিত অধিপতিশীল 'নাটক' প্রত্যয়টি নাকচ করে 'নাট্য' শব্দটি গ্রহণ করেছেন। আর নাট্য যখন মঞ্চস্থ হয় তখন একে নাট্য-প্রযোজনা বলেছেন। নাট্যশিল্পের সাহিত্যিক অংশ, এখনও, আমাদের দেশে 'নাটক' বলেই চিহ্নিত। কিন্তু জামিল আহমেদ এই 'নাটক' প্রত্যয়টিকে নাকচ করে 'নাট্য' প্রত্যয় ব্যবহারের সপক্ষে ধনঞ্জয়কৃত দশরূপক ধারণা থেকে যুক্তি গ্রহণ করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। যদিও তিনি এই লেখায় 'নাট্য' পরিভাষা গ্রহণের যুক্তিটি কী এবং ধনঞ্জয় নাট্য প্রত্যয়টিকে কী অর্থে সংজ্ঞায়িত করেছেন, সেই সম্পর্কে কিছুই আলোচনা করেননি। যেহেতু 'নাটক' শব্দ এড়িয়ে 'নাট্য' পরিভাষা গ্রহণের সিদ্ধান্তটি জামিল আহমেদের সমস্ত আলোচনার ভিত্তি ও কাঠামো নির্মাণ করেছে তাই আমি এখানে এই বিষয়ক আলোচনা সামান্য বিস্তারে ব্রতী হতে চাই।

আমরা জানি যে, দশম শতকে আবির্ভূত অভিনবগুপ্ত আচার্যের কিছু পর বা সমসাময়িক আরেকজন নাট্যশাস্ত্র ব্যাখ্যাকারীর আবির্ভাব ঘটে। তাঁরই নাম ধনঞ্জয়। আধুনিক অনেক ভাষ্যকারের অভিমত হলো, ধনঞ্জয় ভরত মুনিকেই মান্য করে নাট্যশাস্ত্রের 'সংক্ষিপ্য' ভাষ্য রচনা করেন। এই ভাষ্য রচনার ক্ষেত্রে ধনঞ্জয় নিজেও পুনরায় উল্লেখ করেছেন নাট্যশাস্ত্রের সেই অভিলক্ষ্য। দুঃখার্তানাম শ্রমার্তনাম শোকার্তানাম অর্থাৎ দুঃখী ক্লান্ত ও শোকসন্তপ্ত মানুষকে আনন্দ দেওয়াই নাট্যের উদ্দেশ্য। ইতিহাস কেবল জ্ঞান দিতে পারে কিন্তু নাট্য জ্ঞান ও আনন্দ উভয়ই সৃজন করতে সক্ষম। তবে নাট্যের অভিলক্ষ্যে আনন্দ-ই মুখ্য, the aim of nātya as giving pleasure/entertainment (Dhanañjaya, 1969/1941)। এবার তাহলে প্রশ্ন হলো, আনন্দদান যেটির অভিপ্সা সেই নাট্য বলতে কী মনে করা হয়? ধনঞ্জয়-এর আদিসূত্র ভরতের (Bharata, as cited in Rao, 2017) নাট্যশাস্ত্র প্রথম খণ্ডের ১০৭ নং শ্লোক পাঠ থেকে জানা যায়, শ্লোক বলছে, নাট্য হলো সমগ্র ত্রিভুবনের ভাবের অনুকীর্তন। ১১২নং শ্লোকপাঠ থেকে জানা যায় নাট্য প্রতিরূপায়িত করে 'লোকবৃত্ত' অর্থাৎ মানবজীবনের সমগ্রতা। ১১১ নং শ্লোক

বলছে, আনন্দ ও বেদনায় আক্রান্ত লোকস্বভাব যখন অঙ্গ ও অন্যান্য উপায় সহযোগে অভিনয়ের মাধ্যমে রূপায়িত হয় তখন একে নাট্য বলে।

নাট্য সংক্রান্ত এই আলোচনা থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, জামিল আহমেদ জিয়া হায়দারের রচনাকর্মকে নাটক না বলে নাট্য বলে গ্রহণ করছেন একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত থেকে। সেই সিদ্ধান্ত জামিল আহমেদ তাঁর লেখায় প্রকাশ না করলেও, ভাষা ও অবচেতন মনের আন্তঃসম্পর্ক বিবেচনায় রেখে আমরা এখানে সেই সিদ্ধান্তটি সূত্রবদ্ধ করতে পারি। অতএব, আমার পাঠ অনুযায়ী জামিল আহমেদের সিদ্ধান্তটি হলো: জিয়া হায়দারের নাট্য, সমগ্র ত্রিভুবনে বিরাজমান আনন্দ-বেদনা প্রভৃতিতে আক্রান্ত সমগ্র মানবজীবনের স্বভাব, অভিনয়ের ভাষায় রূপায়ণ করার সম্ভাবনা রাখে।

জিয়া হায়দারের ১৫টি নাট্যের মধ্যে ৭টি মৌলিক, ০৪টি রূপান্তর এবং ০৪টি অনুবাদ। জিয়া হায়দার রচিত মৌলিক অনুবাদ ও রূপান্তরকৃত নাট্যকর্মের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছে জামিল আহমেদের এই গবেষণা ("জিয়া হায়দার: অগ্রজ পথিক" ১২)। সৃষ্টিশীল প্রকাশের ধরন বিবেচনায় মৌলিক অনুবাদ ও রূপান্তর– এই তিনটি বর্গ সাব্যস্ত করে জিয়া হায়দারের নাট্য পাঠের ক্রিয়াকে জামিল আহমেদ তিনটি পর্বে বিন্যস্ত করে তাঁর গবেষণার কাঠামো নির্ণয় করেছেন। প্রথম পর্বের শিরোনাম 'মৌলিক কর্ম'। দ্বিতীয় পর্বের শিরোনাম 'রূপান্তর'। তৃতীয় পর্বের শিরোনাম 'অনুবাদ'। জিয়া হায়দারের নাট্যকর্ম ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে 'হারমেনিউটিক' তত্ত্বগত ধারণার আশ্রয় নিয়েছেন বলে জামিল আহমেদ নিজেই উল্লেখ করেছেন। নাট্য ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কেন তিনি হারমেনিউটিক তত্ত্বগত ধারণার ভিত্তিতে পথ চলেছেন সেই কারণ কেবল তিনি এক বাক্যে বলেছেন। সেই বাক্য আমি যেভাবে বুঝেছি তা যদি আমার নিজের ভাষায় বলি তাহলে এমন: হারমেনিউটিক তত্ত্ব অনুযায়ী, সকল রচনা নিজের সীমা অতিক্রম করতে উন্মুখ থাকে এবং পুনঃপাঠের মাধ্যমে উদ্দিষ্ট রচনার অর্থ, ব্যাখ্যাকারীর অর্থযোগে, নতুন সম্ভাবনার অধিকারী হয়ে ওঠে।

জিয়া হায়দার নিয়ে জামিল আহমেদের গবেষণার সারাৎসার আহরণের সুবিধার্থে, আমি তাই এখানে হারমেনিউটিক তত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা প্রসারিত করতে চাই। *The Foundation of Social Research: Meaning and Perspective in the Research Process* বইয়ে মাইকেল ক্রটি (Crotty, 1998, p. 87) জানান, ইউরোপে হারমেনিউটিকস বা ব্যাখ্যাশাস্ত্র-এর বর্তমান অর্থ লাভ করেছে সতেরো শতকে Biblical Studies বা বাইবেল অধ্যয়নের সূত্রে। হারমেনিউটিকস মূলত Scriptures বা পবিত্র গ্রন্থ ব্যাখ্যার কাজে পণ্ডিতদের পথ দেখায়। বাইবেলীয় কোনো টেক্সট-এর প্রকৃত অর্থ কী তার লিপিবদ্ধ ব্যাখ্যাকে বলা হয় এক্সেজেসিস। কার্যকারণের ক্ষেত্রে যুক্তি যেমন, ভাষার ক্ষেত্রে ব্যাকরণ যেমন, এক্সেজেসিসের

ক্ষেত্রে হারমেনিউটিকস বা ব্যাখ্যাশাস্ত্রও তেমন। সেই থেকে বর্তমান দুনিয়ায় জ্ঞানের বিচিত্র আঙিনায় হারমেনিউটিকস বসতি গড়েছে। মানবীয় সকল চর্চা, ঘটনা, পরিস্থিতি পাঠের মাধ্যমে পূর্ণ বোধনে পৌঁছাতে পদ্ধতিগত পথ দেখায় হারমেনিউটিকস (৮৭)। কোনো রচনার মধ্যে, রচনাকারী নিজেও জানেন না এমন লুকায়িত অর্থ ও উদ্দেশ্য দক্ষ হারমেনিউটিক তদন্তে উন্মোচিত হয় (৯১)। হারমেনিউটিকস অনুসারীদের কাছে দান্তে রচিত দ্য ডিভাইন কমেডি-এর দুটো পংক্তি বেশ গুরুত্বপূর্ণ:

> Ye that are of good understanding, note the doctrine that is Hidden under the veil of the strange verse! (Dante, as cited in Crotty, 1998, p. 87)

জিয়া হায়দারের *শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ*, *এলেবেলে*, *সাদা গোলাপে আগুন*, *পংকজ বিভাস* প্রভৃতির বিস্ময়কর পঙক্তির নেকাবের আড়ালে যা যা আছে সেইসব নিয়ে ইতালীয় মহাকবি দান্তে কথিত good understanding বা পরিপূর্ণ বোধনে পৌঁছাতে ব্রতী হয়েছেন আমাদের যুগের নাট্যভুবনের এক ব্যাখ্যাশাস্ত্রকারী সৈয়দ জামিল আহমেদ। ব্যাখ্যাশাস্ত্রের রীতি-পদ্ধতি আশ্রয়ে জামিল আহমেদ আরও দুটো তত্ত্ব-কৌশল অবলম্বন করেছেন। একটি হলো, নাট্য-সংশ্লিষ্ট শিল্পতত্ত্ব। যেমন তিনি যখন *শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ* আলোচনা করছেন তখন অনিবার্য রূপক, সংকেত ও প্রতীক-প্রতীকবাদ নিয়ে আলোচনায় লিপ্ত হচ্ছেন। দ্বিতীয়টি হলো, একটি নাট্যকর্মের নির্দিষ্ট কালিক-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের আলোচনা। যেমন তিনি যখন জিয়া হায়দারের *সাদা গোলাপে আগুন* নাট্য আলোচনার সূত্রপাত করছেন তখন তিনি শুরুই করছেন এভাবে:

> [*সাদা গোলাগে আগুন*] নাট্যের জন্য রচনাকাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্মর্তব্য যে, মুক্তিযুদ্ধ সমাপ্তির মাত্র সাত দিন পর, অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ২৩শে ডিসেম্বর, তৎকালীন ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী আবুল হাসনাত মোহাম্মদ কামারুজ্জমান মুক্তিযুদ্ধে ধর্ষণের শিকার নারীদের 'বীরাঙ্গনা' ঘোষণা করেন। ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ সালে শেখ মুজিব স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি বীরাঙ্গনা অভিধা ব্যাপকরূপে জনপ্রিয় করে তুলেন, এমনকি ধর্ষিতা নারীদের তাঁর মা-বোনরূপেও সম্বোধন করেন। নিঃসন্দেহে এটি ছিল তৎকালীন সরকারের এক সাহসী এবং রেডিক্যাল পদক্ষেপ। কিন্তু এ পদক্ষেপ বিস্ময়কর নয়, কারণ ১৯৭২ সালের প্রথম কয়টি মাস ছিল অন্তহীন আশা ও উদ্দীপনার সময়। বাংলাদেশ তখন সদ্য স্বাধীন। পৃথিবীতে অজেয় কিছুই ছিল না। সেই অসম্ভব আশাদীপ্ত সময়ে রচিত ততোধিক অসম্ভব আদর্শবাদী চেতনার দলিল আশাবাদী *সাদা গোলাগে আগুন*। এই নাট্যের চরিত্র মুক্তিযোদ্ধা আবিদ প্রমাণ করে যে, জিয়া হায়দার

> এ নাট্য রচনা করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সকল আদর্শের প্রতি নিশ্ছিদ্র বিশ্বাস স্থাপন করে, পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তি ভরে (জামিল, ২০২০, পৃপৃ. ২৫–২৬)।

এই ধরনের পাঠ-পদ্ধতি জিয়া হায়দারের সকল নাট্য ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেই জামিল আহমেদ প্রয়োগ করেছেন। এই পাঠ-পদ্ধতি মনে করে, টেক্সট ইজ প্রোডাকশন অফ দ্য কনটেক্সট। যে কোনো পাঠ্য তার প্রতিবেশের উৎপাদন মাত্র। এই সূত্রে বলা হয়, লিটারেচার ইজ সোশ্যাল প্রোডাকশন। সাহিত্য বা যেকোনো শিল্পকর্ম মাত্রই সমাজের উৎপাদন। যেমন প্রখ্যাত মার্ক্সবাদী সমালোচক ক্লিফ স্লটার বলেন, [art] is the product of the men thrown into struggle by the specific contradictions of the given social formation (Slaughter, 1980, p. 23)। অন্যদিকে, সাংস্কৃতিক কাজকর্ম সম্পর্কে মার্ক্সবাদী তত্ত্ব কী তা মাও সে তুং-এর ভাবনায় প্রকাশ পায়: "Works of literature and art, as ideological forms, are the product of the reflection in the human brain of the life of a given society" (Balibar & Macherey, 1996, p. 278). এই সূত্রে আমরা লক্ষ করি, পশ্চিমা অ্যাকাডেমিয়াতে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি সমালোচনার দুটো ধারা গড়ে উঠেছে। একটি হলো, ব্রিটিশ স্কুল। অন্যটি, আমেরিকান স্কুল। ব্রিটিশ স্কুলটি মোটাদাগে, কালচারাল মেটেরিয়ালিজম বা সাংস্কৃতিক বস্তুবাদ কাজে লাগিয়ে একটি শিল্পকর্মের আর্থ-সামাজিক নির্ণায়ক ফ্যাক্টরগুলো উন্মোচন করে। এর ফলে, সাংস্কৃতিক বস্তুবাদ, সমালোচনার ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার ভান করে না। এই ধারাটি কোনো একটি সমাজে শিল্পকর্মের উৎপাদন এবং সেই সমাজে বিদ্যমান সংস্কৃতির বস্তুবাদী শর্তগুলির সম্পর্ককে প্রাধান্য দেয়। অন্যদিকে, আমেরিকান স্কুল হিসেবে নিউ হিস্টোরিসিজম বা নব্য-ইতিহাসবাদী সমালোচনার ধারা রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং সৃষ্টিশীল কাজের আন্তঃসম্পর্ক বিশেষভাবে পাঠ করে। বার্মিংহামে পিএইচডি অধ্যয়নকালে, রাষ্ট্র-ক্ষমতা ও সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিগুলোর মিথস্ক্রিয়া পাঠ করার অ্যাকাডেমিক পদ্ধতি সম্পর্কে আমার যৎসামান্য প্রশিক্ষণ লাভের সূত্রে আমি বলতে চাই, সৈয়দ জামিল আহমেদ জিয়া হায়দারের নাট্যকর্ম ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পাঠ-পদ্ধতির দুই শাখা– কালচারাল মেটেরিয়ালিজম এবং নিউ হিস্টোরিসিজম– উভয়ের সংশ্লেষ ঘটিয়ে একত্রে প্রয়োগ করেছেন।

এই তত্ত্ব-পদ্ধতিগত আলোচনাকে প্রেক্ষাপটে রেখে, এখন আমি পর্যায়ক্রমে, সংক্ষেপে, পুনরাবৃত্তি এড়িয়ে, সারগ্রাহী উপায়ে, জামিল আহমেদের তিন পর্বে বিন্যস্ত জিয়া হায়দার নাট্যপাঠ উদাহরণসমেত পর্যালোচনা করব।

১ম পর্ব: মৌলিক কর্ম

আমরা জানি জিয়া হায়দার মোট ৭টি মৌলিক নাট্য রচনা করেছেন:

১. *শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ* (রচনাকাল সেপ্টেম্বর ১৯৬৯)

২. *এলেবেলে* (রচনাকাল মে-জুন ১৯৭৫)

৩. *সাদা গোলাপে আগুন* (রচনাকাল ফেব্রুয়ারি ১৯৭২)

৪. *পংকজ বিভাস* (রচনাকাল অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৭৩)

৫. *শ্যামলী চৌধুরীর কথা* (রচনাকাল ১৯৯২)

৬. *চৌর্যপদ*

(প্রকাশকাল ২৫শে অক্টোবর ২০০৬, এই নাটকের রচনাকাল সম্পর্কে জামিল আহমেদের আন্দাজ দ্বিতীয় বিএনপি সরকারের আমল অর্থাৎ ১০ অক্টোবর থেকে ২১ অক্টোবর ২০০৬)

৭. *বিস্মরণের নয়*

(জিয়া হায়দারের জীবদ্দশায় এই নাটক অপ্রকাশিত। জামিল আহমেদের অনুসন্ধান বলছে, এই নাটকটি জিয়া হায়দারের শেষ লেখা।)

জিয়া হায়দারের মৌলিক নাট্যকর্মের মধ্যে *শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ* এবং *এলেবেলে*– এই দুই নাট্য নিয়ে জামিল আহমেদ তুলনামূলকভাবে বিস্তৃত আলোচনা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা হাজির করেছেন। তিনি মনে করেন, "জিয়া হায়দারের প্রথম মৌলিক নাট্য রচনা *শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ* আধুনিক বাংলা নাট্যভুবনে নিজস্ব জায়গা করে নিয়েছে ঐতিহাসিক কারণে" (জামিল, ২০২০, পৃ. ১২)। এখন আমার প্রশ্ন হলো শুধুই কি "ঐতিহাসিক কারণে" নাকি নান্দনিক সৌকর্যের কারণেও?

এই প্রশ্নের উত্তরে, প্রথমত, জামিল আহমেদ কথিত "ঐতিহাসিক কারণ" তাঁর নিজের জবানিতেই খুঁজতে পারি:

> ১৯৬০-এর দশকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যখন মূল স্রোতধারার জনপ্রিয় নাট্যগুলো ছিল 'শুভ বিবাহ', 'বৌদির বিয়ে', 'কুয়াশা কান্না', 'সাগর সেচা মানিক', ইত্যাদি সামাজিক মেলোড্রামা, তখন এক ক্ষীণ অথচ গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষাধর্মী ধারায় সমকালীন বিশ্বনাট্যের প্রতিফলন ঘটে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের নাট্যভূবনে যে অভূতপূর্ব প্রাণপ্রাচুর্যময় জোয়ার দেখা দেয়, তার ভিত্তিভূমি ছিল এই নিরীক্ষাধর্মী ধারা। জিয়া হায়দারকৃত *শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ* ১৯৬০-এর দশকের নিরীক্ষাধর্মী ধারার এক গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য উপাদ্য (জামিল, ২০২০, পৃপৃ, ১২–১৩)।

প্রথম সংস্করণে নাট্যকারের ভূমিকা এবং জামিল আহমদের অনুসন্ধান মিলিয়ে পর্যালোচনা করলে এই নাট্য রচনার মূল অনুপ্রেরণা ও কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু এবং নাট্যের সামাজিক-সাংস্কৃতিক

প্রেক্ষাপট স্বচ্ছরূপে ধরা দিতে পারে। এই নাট্য রচনার বীজ প্রোথিত আছে জিয়া হায়দারের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নের অভিজ্ঞতায়। এই নাট্য রচনায় অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তৎকালীন বিদ্রোহী ছাত্রদের সংগঠন Students for a Democratic Society (SDS) আয়োজিত ভিয়েতনাম-যুদ্ধবিরোধী এক সেমিনার। ডেভিড বার্নার রচিত ১৯৬০-এর দশকে শান্তি প্রতিষ্ঠার কর্মতৎপরতা বিষয়ক এক গবেষণার সূত্রে জানা যায়–

> সোভিয়েত ইউনিয়নপন্থী কমিউনিস্ট এবং মার্কিন ডানপন্থীদের 'স্বৈরাচার' অভিধায় প্রত্যাখ্যান করে সংগঠনটি এমন এক গণতান্ত্রিক সমাজের স্বপ্ন দেখে যেখানে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হবে। এই পরিবর্তন সূচনায় শ্রমজীবী-সর্বহারা শ্রেণি নয়, বরং সারা পৃথিবীর যুবা-বুদ্ধিজীবী হবে নতুন বিপ্লবী শক্তি (জামিল, ২০২০, পৃপৃ, ১৩–১৪)।

জামিল আহমেদের (২০২০) ব্যাখ্যা হলো:

> *শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ* একটি 'ড্রামা', অর্থাৎ ট্রাজেডি ও কমেডির মধ্যবর্তী অবস্থানে অধিষ্ঠিত এক নাট্য। নাট্যে প্রতিরূপায়িত চার কেন্দ্রীয় চরিত্র শুভ্রা, সুন্দর, কল্যাণী ও আনন্দ নিউ-লেফট তথা এসডিএস ভাবাদর্শে উচ্চারিত পৃথিবীর যুবা-বুদ্ধিজীবীরূপে আবির্ভূত নতুন বিপ্লবী শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে (পৃ. ১৪)।

এই বক্তব্যের সপক্ষে তাঁর যুক্তি হলো:

> সমাজে প্রচলিত কর্তৃত্ব-কাঠামোর বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করে শুভ্রা, সুন্দর, কল্যাণী ও আনন্দ যথাক্রমে কামিনী-শহর ও বসন্ত-নগর থেকে পালিয়ে এসেছে, কারণ কামিনী-শহরে সমস্ত কামনার কুঁড়িকে হত্যা করা হয়েছে এবং বসন্ত-নগর থেকে বসন্ত পলাতক। [আর তাই] SDS এর যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলনের লক্ষ্য অনুরূপ শুভ্রা, সুন্দর, কল্যাণী ও আনন্দের গন্তব্য শান্তিগড় (পৃ. ১৪)।

তবে, জিয়া হায়দার এই নাট্য রচনায় SDS-এর ভাবাদর্শ অন্ধভাবে অনুকরণ করেননি। নাট্যকার বরং "SDS অনুসৃত ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছেন, পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন আদৌ সম্ভব কি না" (পৃ. ১৪)। এক্ষেত্রে, জামিল আহমেদ অতি গুরুত্বের সঙ্গে জিয়া হায়দারের সৃজনশীল রূপকল্পের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরান:

> নাট্যে দুটি সমাপ্তি দেখানো হয়েছে। একটিতে পৃথিবীর যুবা-বুদ্ধিজীবীরূপে আবির্ভূত নতুন বিপ্লবী শক্তি শুভ্রা, সুন্দর, কল্যাণী ও আনন্দ, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে,

> সুবর্ণগ্রাম জাংশান স্টেশনের ওয়েটিং রুমের অন্ধকারে অপেক্ষমাণ যেন অনন্তকাল থেকে। বিকল্প সমাপ্তিতে কিছুটা আশা যুক্ত [করেছেন] চারজন কেন্দ্রীয় চরিত্রকে এক লণ্ঠনের আলোয় অপেক্ষমাণ রেখে (পৃ. ১৫)।

জামিল আহমেদ আমাদের আরেক কুশলী নাট্যকার মমতাজউদদীন আহমদের বক্তব্যের অনুসরণে বলেন: "শান্তি স্থাপনের আশা সমূলে প্রত্যাখ্যানের প্রতিপাদ্য উপস্থাপনের জন্য জিয়া হায়দার বেছে নিয়েছেন প্রতীকবাদী নাট্যরীতি [...]" (পৃ. ১৫)। প্রতীকবাদী নাট্যকারের নাট্যদর্শন চিহ্নিত করে জমিল আহমেদ বলেন: "প্রতীকবাদী নাট্যকাররূপে জিয়া হায়দার মনে করেন, বিশ্বময় শান্তি স্থাপনের সত্য ও প্রকৃত অবস্থা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা লব্ধ প্রমাণ অথবা যুক্তিসঙ্গত চিন্তার মাধ্যমে অর্জন এবং জ্ঞাপন করা যায় না (পৃ. ১৬)। প্রতীকবাদী নাট্যদর্শন কী নন্দনকৌশলে জিয়া হায়দার এই নাট্যে আত্মস্থ করেছেন সেই সৃজন-প্রক্রিয়াও অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে জামিল আহমেদ ব্যাখ্যা করেন:

> দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতা প্রত্যাখ্যান করে তিনি বিমূর্ত চিন্তার প্রতিরূপায়ণ ঘটিয়েছেন, ভাবকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুরূপে উপস্থাপন করেছেন প্রতীক গ্রহণ করে, যে প্রতীক উপায় মাত্র, মূল লক্ষ্য নয়। প্রতীকবাদী নাট্যরীতির সঙ্গে জিয়া হায়দার চরিত্র নির্মাণের জন্য বেছে নিয়েছেন রূপকাশ্রিত কৌশল [...] দ্বান্দ্বিক রূপক উপস্থাপনের মাধ্যমে আলোচ্য নাট্যের জীবনদর্শন সুস্পষ্টরূপে বিধৃত হয়: শান্তি স্থাপনের অভিযাত্রায় মানব জাতি তার অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যের আত্মবিরোধের কারণেই ব্যর্থ হবে (পৃ. ১৬)।

জামিল আহমেদ নাট্যক্রিয়ার গতিশীলতার কারণে *শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ* নাট্যের রচয়িতা জিয়া হায়দারকে সার্থক প্লট নির্মাতা হিসেবে অভিহিত করলেও, "অনভিপ্রেত বাচনিক দুর্বলতার কারণে" একে সমস্যাজনক বলেও মনে করেছেন (পৃ. ১৮)। এই বিষয়ে তাঁর যুক্তি হলো "বাচনিক ছন্দ, গঠনভঙ্গি, বিন্যাস ও বয়নপ্রণালীর প্রভেদহীনতার কারণে চার কেন্দ্রীয় চরিত্র শুভ্রা, সুন্দর, কল্যাণী ও আনন্দের সংলাপে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য উপলব্ধি করা কঠিন হয়ে যায় (পৃ. ১৭)।

চার কেন্দ্রীয় চরিত্রের সংলাপে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য উপলব্ধি না করতে পারার যুক্তিতে *শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ* নাট্য যদি জামিল আহমদের কাছে দুর্বল বলে মনে হয়, তাহলে, এই বিষয়ে, আমি ভিন্নমত হাজির করতে আগ্রহী। এক্ষেত্রে, আমার ভিন্ন যুক্তি ও মত উপস্থাপনের পূর্বে, আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই রবীন্দ্রনাথের *চণ্ডালিকা* নাট্যের কথা। সেই নাট্যে চণ্ডাল শ্রেণির মুখের ভাষা যেমন অনুপস্থিত, তেমনই প্রকৃতি ও তার মায়ের "বাচনিক ছন্দ, গঠনভঙ্গি, বিন্যাস ও বয়নপ্রণালীর" মধ্যেও কোনো প্রভেদ লক্ষ করা যায় না। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের

নাট্যকে বাচনিকভাবে দুর্বল বলা সম্ভব কি? এই বিষয়ে জামিল আহমেদের যুক্তি ধার করেই তার যুক্তি খণ্ডন করতে চাই। প্রতীকবাদী নাট্য যদি দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতা প্রত্যাখ্যান করে "বিমূর্ত চিন্তার প্রতিরূপায়ণ" ঘটায়, তাহলে, নাট্যে চরিত্রের বচনে "দৈনন্দিন জীবনের" নিয়ম অনুসরণ করে বাস্তববাদী পদ্ধতিতে চরিত্রের সংলাপে বাচনিক প্রভেদ খোঁজা কি প্রতীকবাদী নাট্য-নন্দনের বিরোধী নয়? এই যুক্তিতে, জামিল আহমেদের *শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ* নাট্যের বাচনিক দুর্বলতা বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে করি।

পরিশেষে, জামিল আহমেদ এই নাট্যের ব্যাখ্যায় যে বিষয়টি একেবারেই আলোচনা করেননি তা হলো– এই নাট্যে অন্তঃসলিলারূপে প্রবহমান ইংরেজ ঔপনিবেশিক ইতিহাসের শর্ত থেকে পাওয়া বঙ্গীয় আধুনিকতার প্রভাব। ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্ট বা আলোকায়নের প্রধান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট যেমন মনে করেন:

আধুনিক মানবজাতি একটি যুক্তি-ব্যবস্থার অধীন। যুক্তি প্রয়োগের দুটি পরিসর আছে– একটি ব্যক্তিগত, অপরটি সমষ্টিগত। আধুনিক ব্যক্তি 'অ্যা কগ ইন দ্য মেশিন'– একটি বিরাট যন্ত্র ব্যবস্থার ছোটো খাঁজকাটা চাকার একটি খাঁজ মাত্র। আধ্যাত্মিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অর্থাৎ নৈতিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় যুক্তিশীল বিরাট সাংগঠনিক ব্যবস্থার অধীনে ও সাপেক্ষে ব্যক্তি যুক্তির চর্চার মাধ্যমে 'অপরিপক্কতার দশা' থেকে মুক্তি অন্বেষণ করে (শাহমান, ২০২২, পৃ. ১২৩)।

বঙ্গীয় আধুনিকতার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ প্যারাডাইম যদি হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তবে রবীন্দ্রচিন্তায় খুঁজে পাওয়া যায় আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধ। যেমন তাঁর *শ্যামলী* কাব্যগ্রন্থভুক্ত "আমি" কবিতা:

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে,
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে (পংক্তি ১-৫)।

পশ্চিমের আলো অর্থাৎ ঔপনিবেশিক আধুনিকতা এবং পুবের আলো অর্থাৎ প্রাচীন ভারতীয় ও বঙ্গীয় সংস্কৃতি-সভ্যতার আলো মিশে গিয়ে এক "বিশ্ব-আমি" তৈরি হয়। সেই আমি উচ্চারণ করে:

গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর',
সুন্দর হল সে। তুমি বলবে, এ যে তত্ত্বকথা, এ কবির বাণী
নয়।
আমি বলব, এ সত্য,
তাই এ কাব্য (পংক্তি ৬-১১)।

অতএব, আমার প্রস্তাব হলো রবীন্দ্র-নির্মিত বঙ্গীয় আধুনিকতার এক আলোক-সন্তান জিয়া হায়দার এবং তার মানস সন্তানরূপী শুভ্রা, সুন্দর, কল্যাণী ও আনন্দ– এই চরিত্রেরা কেবলই জামিল আহমেদ কথিত "পৃথিবীর যুবা-বুদ্ধিজীবীরূপে আবির্ভূত নতুন বিপ্লবী শক্তি নয়। ওরা বঙ্গীয় আধুনিকতার ধারায় দ্বন্দ্ব-বিদীর্ণ সেক্যুলার মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত একগুচ্ছ চরিত্রও বটে। তাদের নাম এই ইঙ্গিত দেয় যে, ইউরোপীয় আলোকায়নপ্রসূত ধারণা এবং সত্যম শিবম সুন্দরম-এর বিনির্মিত ধারণা দিয়ে তারা নির্মিত। তাদের লক্ষ্য হলো শান্তি তথা সৌন্দর্য সন্ধান করে "মানবজাতির পর্যায়ক্রমিক মুক্তির লক্ষ্যে আধুনিকতাবাদী বিশ্বজনীন প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথ কথিত সেই "বিশ্ব-আমি" হয়ে উঠতে চায়। শুভ্রা, সুন্দর, কল্যাণী ও আনন্দের এই "বিশ্ব-আমি" হতে চাওয়া যেন নাট্যকার জিয়া হায়দারের নিজেরও হতে চাওয়া।

এই পর্যায়ে, জিয়া হায়দারের মৌলিক নাট্য নিয়ে জামিল আহমেদের সমালোচনার কেবল তাঁর প্রতিনিধিত্বশীল একটি দৃষ্টান্ত পাঠ শেষে পরের পর্বে প্রবেশ করতে চাই।

২য় পর্ব: রূপান্তর

জামিল আহমেদের গবেষণার দ্বিতীয় পর্বের নাম 'রূপান্তর।' এই পর্বে আলোচিত হয়েছে জিয়া হায়দারের চারটি নাট্যরূপান্তর:

১। *উন্মাদ সাক্ষাৎকার*

(মার্কিন কথাসাহিত্যিক এডগার এলান পো রচিত, ১৮৪৫ সালে প্রকাশিত The System of Doctor Tarr and Professor Fether ছোটগল্পের recontextualization এবং reworking প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত। জামিল আহমেদের বিশ্লেষণী অনুমান অনুযায়ী এই নাট্যের রচনাকাল ১৯৭৯ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে।)

২। *মুক্তি মুক্তি*

(মার্কিন কবি নাট্যকার ও সমালোচক আমিরি বারাকা রচিত Great Goodness of Life নাট্যের পূর্বোল্লেখিত প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত। এই নাট্যের রচনাকালও আনুমানিক ১৯৭৯ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে।)

৩। *প্রজাপতি নির্বন্ধ*

(জিয়া হায়দার আতাউর রহমানের সঙ্গে যৌথভাবে এই নাট্য রূপান্তর করেছেন। এর মূল নাট্য রুশ লেখক নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ গোগল রচিত কমেডি যেনিত'বা। ক্রিস্টোফার ইংলিশ কর্তৃক ইংরেজি মূলানুবাদের শিরোনাম *Marriage: An Utterly Impossible Occurrence in Two Acts*। তবে গোগলের এই নাট্যের ভাবানুবাদ করেছেন প্রখ্যাত নাট্যসমালোচক এরিক বেন্টলি যার সংক্ষেপিত নাম *The Marnage*। জিয়া হায়দার এবং আতাউর রহমানের *প্রজাপতি নির্বন্ধ* ১৯৭৩ সালে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁদের ভূমিকা থেকে জানা যায় এই নাট্যের ভিত্তি এরিক বেন্টলি'র ভাবানুবাদ। আরও জানা যায়, ১৯৭০ সালে নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় ঢাকা বেতারে তা পরিবেশন করেন। এই সূত্রে জামিল আহমেদের অনুমান প্রজাপতি নির্বন্ধ ১৯৭০ সালে রচিত হয়েছে।

৪। *তাইরে নাইরে না*

(১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত এই নাট্যের ভূমিকা থেকে জানা যায় ১৯৭৮ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে জিয়া হায়দার তা রচনা করেন। এডমন্ড রোঁস্তাদ রচিত কমেডি *The Romancers*-কে টম জোন্স কথা ও গান লিখে এবং হার্ভে স্মিট সংগীত যোজনা করে রূপান্তর করেন মিউজিকাল *The Fantasticks*। এটাকেই রূপান্তর করেন *তাইরে নাইরে না* নামে। জামিল আহমেদ আরও তথ্য সংযোজন করে জানান ইউরোপে রেনেসাঁর যুগে দেশে দেশে বিপুল জনপ্রিয় *রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট* উপাখ্যানের একটি অফশুট বা প্রশাখা হলো *তাইরে নাইরে না*। এই জনপ্রিয়তার বংশপরম্পরার দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা যায় শেক্সপিয়রের ট্র্যাজেডি *Romeo and Juliet*, লোগে দে ভেগার ট্র্যাজি-কমেডি *Capulets and Montagues*, এডমন্ড রোঁস্তাদের *The Romancers*।

এই পর্যায়ে, দুটো পরস্পর সম্পর্কিত প্রসঙ্গের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। একটি প্রসঙ্গ হলো, রূপান্তরের ক্ষেত্রে জিয়া হায়দারের নাট্যসিদ্ধি কতটুকু? অপরটি হলো, রচনার এই সিদ্ধি বা উৎকর্ষতা পরিমাপের ক্ষেত্রে সৈয়দ জামিল আহমেদ অনুসৃত নাট্যমীমাংসা পদ্ধতিটি কী? এই দুই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে এখানে দুটো রূপান্তরিত নাট্যের উদাহরণ টানতে চাই। একটি হলো, *প্রজাপতি নির্বন্ধ* জিয়া হায়দার ও আতাউর রহমান রচিত এই নাট্যকে জামিল আহমেদ

"একটি সার্থক রূপান্তর" আখ্যা দিয়েছেন। এই সার্থকতার কারণ জানতে জামিল আহমেদকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

[*প্রজাপতি নির্বন্ধ*] রূপান্তর কর্মে রূপান্তরকারীগণ মূল নাট্যের কাঠামো হতে খুব একটা বিচ্যুত হননি। বাস্তববাদী রীতি অনুবর্তী *প্রজাপতি নির্বন্ধে* উপস্থাপিত চরিত্রসমূহের ভাষা ইঙ্গিত করে যে, নিকোলাই গোগলের মূল নাট্যে এবং এরিক বেন্টলির অনুবাদে দৃষ্ট রুশ প্রেক্ষাপট রূপান্তরিত হয়েছে ১৯৬০-এর দশকের পূর্ব পাকিস্তানের কোনো এক শহরে। সংলাপ প্রাঞ্জল, প্লট গতিশীল। অধিকাংশ চরিত্রের বাচনিক ছন্দ, গঠন, ভঙ্গি, বিন্যাস ও বয়নপ্রণালীর প্রভেদ বিদ্যমান। অতএব, এটি একটি সার্থক রূপান্তর (জামিল, ২০২০, পৃ. ৪৮)।

দ্বিতীয়াট হলো: *তাইরে নাইরে না*। একে জামিল আহমেদ '[জিয়া হায়দারের] অত্যন্ত দুর্বল রূপান্তর হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই দুর্বলতার কারণ জানতে আবার জামিল আহমেদকে স্মরণ করা যেতে পারে:

> জিয়া হায়দার তাঁর রূপান্তরে রূপকের প্রয়োগ করেছেন বটে, কিন্তু *The Fantasticks* মিউজিক্যালটির কেবল প্রথম অঙ্কের রূপান্তর এটি। এর কারণ ব্যাখ্যা করে [জিয়া হায়দার] বলেন, "আমি 'তাইরে নাইরে না'-কে পুরোপুরিই লাইট কমেডি রাখতে চেয়েছি। নিঃসন্দেহে জিয়া হায়দারের উদ্দেশ্য সার্থক, কিন্তু *The Fantasticks*-এর দ্বিতীয় অঙ্ক ব্যতিরেকে *তাইরে নাইরে না* এক সরল ভাববাদী রোমান্টিক কমেডি, প্রায় বলিউডে নির্মিত হালকা রোমান্টিক কমেডির কাতারভুক্ত। এছাড়া, 'ছেলে' ও 'মেয়ে' চরিত্রদ্বয়ের দুই মায়ের দুটি চরিত্র সংযোগ করে তিনি নারীবাদী আন্দোলনের প্রতি অনভিপ্রেত ব্যাঙ্গ ছুঁড়ে পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব ব্যক্ত করেছেন মাত্র এ সকল কারণে *তাইরে নাইরে না* অত্যন্ত দুর্বল রূপান্তর (জামিল, ২০২০, পৃ. ৫২)।

জিয়া হায়দার রচিত নাট্যের রূপান্তর বিচারের ক্ষেত্রে তত্ত্ব-পদ্ধতিগত দিক থেকে সম্প্রতি বিকশিত জ্ঞানকাণ্ড Adaptation Studies বা রূপান্তরবিদ্যা থেকে রসদ গ্রহণ করেছেন জামিল আহমেদ। *উন্মাদ সাক্ষাৎকার*, *মুক্তি মুক্তি* এবং *প্রজাপতি নির্বন্ধ*– এই তিনটি রূপান্তরে "বর্জন, পুনর্লিখন, এমনকি সংযোজন সত্ত্বেও রূপান্তরকর্মটি মূল লেখকের কর্মের সঙ্গে সাদৃশ্য বজায় রাখে [বিধায় নাট্যের] আদি উৎস প্রবহমান থাকে" (জামিল আহমেদ, ২০২০, পৃ. ৩৬)। বিশেষত, *প্রজাপতি নির্বন্ধ* নাট্যে আদি উৎস প্রবহমান রেখে রূপান্তরকারীগণ বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে সংলাপের ধরনে প্রভেদ সৃষ্টি করে এবং প্রেক্ষাপটের কার্যকর বদল ঘটিয়ে প্রাসঙ্গিক করার ফলে সার্থক রূপান্তর হয়ে উঠেছে– জামিল আহমেদের এই হলো রূপান্তর বিচারের পদ্ধতি।

এক্ষেত্রে, আমার বক্তব্য হলো, চরিত্রানুগ সংলাপ সৃষ্টি আর কাহিনির প্রেক্ষাপটের প্রাসঙ্গিক স্থানান্তর বিবেচনার ফলে, জামিল আহমেদ নাট্যের সেমিওটিক বা চিহ্নতাত্ত্বিক, অথবা অন্যভাবে বললে, ফর্মালিস্ট বা আঙ্গিকগত একটি বাহ্য রূপ অন্বেষণেই কেবল সীমাবদ্ধ থেকেছেন। এই সীমাবদ্ধতার কারণ, রূপান্তর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে "ইনটেনশনাল রিডিং" মেথডের ব্যবহার। ইংল্যান্ডের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পিএইচডি গবেষণায় শেক্সপিয়রের পেরিক্লিসে নাট্য রূপান্তর করে *শ্যাটার্ড ফেসেস অফ পিয়ার আলী* (পিয়ার আলীর ভাঙা মুখ) রচনার অভিজ্ঞতা ফিরে দেখে বলতে চাই, জিয়া হায়দারের নাট্য রূপান্তর বিচারের ক্ষেত্রে জামিল আহমেদের মীমাংসা পদ্ধতির মধ্যে একটি মিসিং পয়েন্ট বা অভাব রয়েছে। আমার শিক্ষক জামিল আহমেদের পদ্ধতির মধ্যে যা হারিয়ে গেছে তা হলো "সিম্পটমেটিক রিডিং" কৌশল। এই পাঠ-পদ্ধতি প্রয়োগ করে সাব্যস্ত করা যায় কোনো একটি আদি উৎস বা টেক্সটের "অচিহ্নিত সাংস্কৃতিক শর্তাবলী" (Abbott, 2002, p. 196)। এই শর্তাবলী চেনার মাধ্যমে জানা যায় একটি টেক্সটের মধ্যে লুকায়িত "malleability" বা "নমনীয়তা" (Holderness, 2014, p. 10)। এটি কোনো টেক্সটের এমন গুণ যা ওই টেক্সটকে না ভেঙেই অন্য রূপ দেবার সম্ভাবনা জারি রাখে। এর ফলে, সৃষ্টিশীল অন্য লেখক-পাঠকেরা অনুধাবন করতে সক্ষম হোন যে, "the textual condition's only law is the change of law" (Jerome McGana, as cited in Holderness, 2014, p. 2)। অর্থাৎ টেক্সটের শর্তের মধ্যে একমাত্র বিধান যা থাকে তা হলো পরিবর্তনের বিধান। এর ফলে, একটি সংস্কৃতির মধ্যে কোনো এক কালে কোনো এক সৃষ্টিশীল লেখক বা নাট্যকারের রচনা, অন্য কোনো কালে অন্য আরেক সংস্কৃতির মধ্যে যথাযথ হয়ে উঠতে পারে। এই যথাযথতাকে ইংরেজিতে বলা হয় Appropriation। কারণ, "Appropriation Studies are more likely, by definition, to be concerned with the impact we have on the plays and the impact they have on us" (Jean Marsden, as cited in Holderness, 2014, p. 3).

এই সূত্রে আমার প্রস্তাব হলো, জিয়া হায়দারের নাট্যরূপান্তর পাঠের ক্ষেত্রে, জামিল আহমেদ অনুসৃত Adaptation Studies অন্ধভাবে অনুসরণ না করে, বরং, Appropriation Studies থেকেও দিক-নির্দেশ গ্রহণ করা যেতে পারে। কারণ, আন্দাজ করা যায় যে, জিয়া হায়দার নাট্যরূপান্তরের বেলায় অবচেতন মনে হলেও, মূল রচনাগুলির মধ্যে থাকা নমনীয়তার গুণ চিনতে পেরেছিলেন, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ওই মূল টেক্সটের পরিবর্তন সম্ভাবনার বিধান। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই সম্ভাবনাময় নমনীয় টেক্সটগুলোর নাট্যরূপান্তর করে, বিশ্বের বিবিধ সৃষ্টিশীল কর্ম বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে যথাযথ বা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করে আমাদেরকে ঋদ্ধ করবেন।

তৃতীয় পর্ব: অনুবাদ

জামিল আহমেদ (২০২০) ভূমিকা ও উপসংহার ব্যতীত তিন পর্বে তাঁর গবেষণালব্ধ যে আলোচনা হাজির করেছেন, এর শেষ পর্ব বিন্যস্ত হয়েছে জিয়া হায়দারের অনুবাদকর্ম ঘিরে। জিয়া হায়দার মোট চারটি নাট্য ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন। এর মধ্যে একটি আতাউর রহমান সহযোগে এবং *পাখির বাসা* নামক অন্য আরেকটি অনুবাদকর্ম "খোয়া যাওয়া পাণ্ডুলিপি" বিধায় জামিল আহমেদের গবেষণায় বিশ্লেষিত হয়নি (পৃ. ৫৪)। এখানে পর্যায়ক্রমে তিনটি অনুবাদকর্ম বিষয়ক জামিল আহমদের পাঠ আমি পুনঃপাঠ করছি।

১. *দ্বাররুদ্ধ*

ফরাসি অস্তিত্ববাদী দার্শনিক ও নাট্যকার জ্যাঁ পল সার্ত্র রচিত *Hui Clos* নাট্যের স্টুয়াট গিলবার্টকৃত ইংরেজি অনুবাদ *No Fixit* থেকে আতাউর রহমান সহযোগে জিয়া হায়দার অনুবাদ করেন *দ্বাররুদ্ধ* নামে। ১৯৭০ সালে প্রকাশিত অনুবাদটি ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত নাগরিক নাট্যসম্প্রদায়কে উৎসর্গ করা হয়। এই সূত্রে, জামিল আহমেদের অনুমান হলো *দ্বাররুদ্ধ* ১৯৬৮ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে অনূদিত হয়েছে। অস্তিত্ববাদী দর্শন রূপায়িত এই নাট্যে প্রতিফলিত হয় 'existence precedes essence', অর্থাৎ মানুষের সারসত্য তার অস্তিত্বের চেয়ে আগে নয় (জামিল আহমেদ ৫৫)। এই কারণে "প্রত্যেক মানুষের অপরিহার্য কর্তব্য [হলো] সকল ভীতি ও উদ্বেগ অতিক্রমের মাধ্যমে তার স্ব-স্বাধীনতা ও দায়িত্ববোধ অর্জন করা (পৃ. ৫৫)।

২. *ডক্টর ফস্টাস*

ইংরেজ এলিজাবেথীয় কবি ও নাট্যকার ক্রিস্টোফার মার্লো রচিত *ট্র্যাজিকাল হিস্ট্রি অফ ডক্টর ফস্টাস* অবলম্বনে জিয়া হায়দার এই অনুবাদ সম্পন্ন করেন ১৯৭০ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে। জামিল আহমেদ এই অনুবাদকর্মের আলোচনায় *ডক্টর ফস্টাস* নাট্যের মূল বক্তব্য হিসেবে উল্লেখ করেন: 'জ্ঞান অন্বেষণের ক্ষেত্রে নৈতিক মূল্যবোধ অনস্বীকার্য (পৃ. ৫৫)।

৩. *অ্যান্টিগনে*

সফোক্লিস রচিত ধ্রুপদী গ্রিক ট্র্যাজেডি *অ্যান্টিগনে* আধুনিক ট্র্যাজেডি আকারে ফরাসি নাট্যকার জ্যাঁ আনুই রূপান্তর করেন। জ্যাঁ আনুই দ্বারা পুনঃসৃজিত *অ্যান্টিগনে* নাট্য লুই গ্যালাতিয়ে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। গ্যালাতিয়ে'র ইংরেজি অনুবাদে অ্যান্টিগনে নাট্য জিয়া হায়দার যে সময়ে অনুবাদ করেন, সে সময়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দখলদারিত্বের ইতিহাস। আমরা জানতে পারছি যে, আনুই'র নাটকটি ১৯৪৪ সালে যখন প্যারিসে প্রথম মঞ্চস্থ হয় তখন ফ্রান্স নাৎসি জার্মানির দখলে। অন্যদিকে, জিয়া হায়দার যখন চট্টগ্রামে এই নাট্য অনুবাদ শুরু করেন তখন

১৯৭১ সাল। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। যদিও এর অনুবাদ সম্পন্ন হয় ১৯৭৩-৭৪ সালে। জামিল আহমদের পাঠ অনুযায়ী এই নাট্যে "সুস্পষ্টরূপে, অ্যান্টিগনে এবং ক্রেয়নের দ্বন্দ্ব [দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ফরাসী প্রতিরোধ বাহিনী এবং নাৎসি দখলদার বাহিনীর আদর্শগত দ্বন্দ্বের সমান্তরালে উত্থাপিত হয়েছে" (পৃ. ৫৬)। জামিল আহমেদ এই নাট্যের অনুবাদকর্ম এবং জিয়া হায়দারের অন্যান্য নাট্য রচনার সময়কাল বিবেচনা করে নাট্যশিল্পীর রাজনৈতিক মনের মানচিত্র বিষয়ে একাট হদিস দেন:

> নাট্য রচনার এই কালক্রম ইঙ্গিত করে, স্বাধীনতা-উত্তর কালে জিয়া হায়দার পূর্বতন 'অরাজনৈতিক' মানসভূম পরিত্যাগ করে রাজনৈতিক মতাদর্শে শাণিত হয়ে উঠেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে *অ্যান্টিসনে* তাঁর নিকট যেমন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রতি অস্বীকৃতি এবং আনুগত্যের দ্বন্দ্বের এজাহার স্বরূপ ছিল, তেমনি ১৯৭৩-৭৪ সালে, যখন মুক্তিযুদ্ধের সকল আদর্শের প্রতি নিশ্ছিদ্র বিশ্বাস বিবর্ণ হয়ে গেছে, সেই ক্ষরণের কালে *অ্যান্টিগনে* আবারও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রতি তাঁর অস্বীকৃতি এবং আনুগত্যের বিষয়ে বিরোধের রূপে মূর্ত হয় (পৃ. ৬২)।

জিয়া হায়দারের মৌলিক নাট্য এবং রূপান্তর নিয়ে আলোচনা বিস্তারের ক্ষেত্রে জামিল আহমেদ যে থিওরিটিক্যাল রিগার অ্যান্ড ভিগার অর্থাৎ তাত্ত্বিক তেজস্বিতা ও প্রাণশক্তি প্রদর্শন করেছেন, সেই তুলনায় অনুবাদকর্ম বিষয়ক আলোচনার অংশটি নিতান্তই সংক্ষিপ্ত এবং পুরো আলোচনার কাঠামোতে বিক্ষিপ্ত অনুপ্রবেশ বলে মনে হয়। তথাপি, জিয়া হায়দার এবং আতাউর রহমানকৃত তিনাট অনুবাদকর্ম নিয়ে জামিল আহমেদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকেই আমরা এখানে জামিল আহমেদের তিনটি সিদ্ধান্ত ছেঁকে নিতে পারি।

প্রথম সিদ্ধান্ত হলো: "জিয়া হায়দার (এবং আতাউর রহমান) কৃত অনুবাদত্রয়ে" মূলের সাদৃশ্য রয়েছে কিন্তু ভাবার্থ নেই। এই সিদ্ধান্ত দেবার ক্ষেত্রে জামিল আহমেদ অভিধান থেকে অনুবাদ শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ করেছেন 'ভাবার্থে সদৃশ্য বলা" (পৃ. ৫৬)। যদিও তিনি অভিধানসূত্র নির্দেশ করেননি। জামিল আহমেদের এই সিদ্ধান্ত মেনে নেবার ক্ষেত্রে আমার সমস্যা হলো, অভিধানে অনুবাদের আরও অর্থ রয়েছে যেসব জামিল আহমেদ বিবেচনায় নেননি। যদি আমরা সেগুলির কিছু বিবেচনা করি, তাহলে, জিয়া হায়দার এবং আতাউর রহমানের অনুবাদের অন্যতর তাৎপর্য ধরা পড়তে পারে যা জামিল আহমেদের সমালোচনায় গরহাজির। যেমন, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত *বঙ্গীয় শব্দকোষ* সংস্কৃত থেকে আগত অনুবাদ শব্দের ১০টি অর্থ নির্দেশ করে। বুৎপত্তিগত দিক থেকে অনুবাদ অ– অর্থাৎ অনু আর বাদ মিলে অনুবাদ শব্দ গঠিত। জামিল আহমেদ যেভাবে অনুবাদ শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ নির্ণয় করেছেন সেই অস্পষ্টতা

দূর করে আমরা বলতে পারি অনু অর্থ আবার বা পুনরায় বা পরে এবং বাদ অর্থ কথা। তাহলে অনুবাদ অর্থ হলো "ভাষান্তরে পুনঃকথন" (হরিচরণ, ১৯৩৪, পৃ. ৮১)।

অতএব, জামিল আহমেদের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করে, এর বিপরীতে আমার প্রস্তাব হলো, জিয়া হায়দারের অনুবাদ বাংলা ভাষার বিধান মেনে, মূল নাট্যগুলোকে "ভাষান্তরে" পুনরায় বলতে পেরেছে কিনা এবং বাংলা "ভাষান্তরে পুনঃকথন" রূপে নাট্যগুলি আগ্রহী বাংলাভাষী জনগণের কাছে বোধগম্য হয়েছে কিনা সেই বিবেচনা আমাদের করতে হবে যা জামিল আহমেদ করেননি।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হলো: জিয়া হায়দারের অনুবাদ মূল নাট্যের ভাবার্থ প্রকাশে ব্যর্থ হবার কারণ হলো, বাংলা ভাষার বাচনিক চিহ্ন-প্রণালী দিয়ে ইংরেজি ভাষার বাচনিক চিহ্ন-প্রণালীকে ব্যাখ্যা করার ব্যর্থতা। এক্ষেত্রে, জামিল আহমেদ রোমান জ্যাকবসনের অনুবাদ বিষয়ক ভাষাতাত্ত্বিক সূত্র প্রয়োগ করেন। এই সিদ্ধান্তে আসার ক্ষেত্রে, জ্যাকবসনের সূত্র প্রয়োগ করে *অ্যান্টিগনে* নাট্যের ইংরেজি ও বাংলা দুটো সংলাপের তুলনা করে দেখিয়েছেন। কিন্তু জামিল আহমেদের এই তুলনার মুশকিল হলো, মূল ফরাসির সঙ্গে ইংরেজির তুলনা জামিল আহমেদের বয়ানে গরহাজির। জামিল আহমেদের এই সিদ্ধান্ত যদি সঠিকও হয়ে থাকে কিন্তু একে গ্রহণ করা সঠিক হবে না। কারণ তিনি এই সিদ্ধান্ত প্রণয়নের ক্ষেত্রে যে যুক্তির প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছেন তার মধ্যে অসঙ্গতি রয়েছে। এই অসঙ্গতি দূর হতে পারত যদি তিনি মূল ফরাসির সঙ্গে ইংরেজি, এবং ফরাসি ও ইংরেজি উভয় সংলাপের সঙ্গে বাংলা সংলাপের তুলনা করতেন।

তৃতীয় সিদ্ধান্ত হলো: জামিল আহমেদের (২০২০) ভাষায় "অনুবাদ তিনটির অপর দুর্বলতা বাচনিক। [...] বাচনিক ছন্দ, গঠন ভঙ্গি, বিন্যাস ও বয়নপ্রণালীর প্রভেদহীনতার কারণে তিনটি অনুবাদকৃত্য নাট্যের সংলাপে চরিত্রসমূহের বৈশিষ্ট্যগত প্রভেদ অনুপস্থিত (পৃ. ৫৫)। আমার প্রস্তাব হলো, তাঁর এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারি।

চতুর্থ সিদ্ধান্ত হলো: এই দুর্বলতা সত্ত্বেও, জামিল আহমেদ মনে করেন, "অনুবাদকর্ম তিনটির জন্য জিয়া হায়দার (এবং আতাউর রহমান) ধন্যবাদার্হ" (পৃ. ৫৫)। অনুবাদকদের এই ধন্যবাদ দেবার কারণ হিসেবে জামিল আহমেদ উল্লেখ করেন: "বাংলা ভাষার প্রতি উগ্র জাতীয়তাবাদী মনোভাবাপন্ন বাংলাদেশের নাট্যকর্মী ও নাট্য বিষয়ে অধ্যয়নে নিবিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীগণের যেখানে ইংরেজি ভাষার প্রতি প্রীতির অভাব লক্ষণীয়, সেখানে আলোচিত তিনটি নাট্য বিদেশি নাট্যভূবনের দরজা খুলে দেয় (পৃ. ৫৫)। এই সুযোগে, আমিও জিয়া হায়দার এবং আতাউর রহমানকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাতে চাই। তবে, আমার ধন্যবাদের কারণ, জামিল আহমেদের ধন্যবাদের কারণ থেকে আংশিক আলাদা। আফ্রিকান লেখক নগুগি ওয়া থিয়ঙ্গ'র চিন্তা অনুসরণে বলা যায়, বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণির যৌথ মগজে ঔপনিবেশিকতার ভূত অতি সক্রিয় থাকার

কারণে, ইংরেজি ভাষার প্রতি তাদের প্রীতির অভাব আছে এটা হলফ করে বলা যায় না। অনুবাদ কেবল বিদেশি নাট্যভুবনের দরজা খুলে দেয় না, বিদেশরূপী "অপরকে" ঘনিষ্ঠরূপে উপলব্ধি করতেও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মার্কিন অ্যাকাডেমিয়ার অতি খ্যাতিমান বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও অনুবাদতাত্ত্বিক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক যেমন বলেন, অনুবাদ হলো সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতম পাঠক্রিয়া। অনুবাদ করা এবং পড়ার মাধ্যমে নিজের মধ্যে অপরের অস্তিত্বের উপস্থিতি প্রগাঢ়ভাবে অনুভব করা যায় (Spivak, 1993, p. 179)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *মানুষের ধর্ম* শীর্ষক রচনায় বলেন, "যেখানে [মানুষ] প্রত্যেকে নিজেরই স্বতন্ত্র জীবন সীমায় বর্তমান সেখানে তার মধ্যে রহস্য কিছুই নেই। কিন্তু, যেখানে তারা নিজের জীবনসীমাকে অতিক্রম করে সমস্ত দেহের জীবনে সত্য সেখানে তারা আশ্চর্য, সেখানে তারা আপন স্বতন্ত্র জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে বদ্ধ নয় (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৯, পৃ. ১০)। অর্থাৎ মানুষকে মানুষ হতে হলে নিজের সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করে বৃহৎ অপরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতে হয়। নিজের মানুষ হতে হলে অপর মানুষের অস্তিত্ব উপলব্ধির কাজে, অনুবাদ আমাদের জীবনে নৈতিক-রাজনৈতিক-আধ্যাত্মিক ভূমিকা রাখে।

তাছড়াও, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের চিন্তার ভিত্তিতেই অ্যান্থনি পিম বলেন, "[...] The main difference between one text and the other could be not in space, but in time. Translation can then be seen as a constant process of updating and elaborating, rather than as some kind of physical movement across cultures" (Pym, 2009, p. 2). মানুষ হওয়ার প্রক্রিয়ায় নিজের মধ্যে অপরকে উপলব্ধি করতে, সময়োপযোগী ও সম্প্রসারণের নিত্য চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে অনুবাদের কাজ করতে, একটি নৈতিক-সাংস্কৃতিক দায় পালন করেছেন বলে এই তৃতীয় প্রজন্ম থেকে আমি জিয়া হায়দারকে ধন্যবাদ দিতে চাই।

উপসংহার

জামিল আহমেদের (২০২০) উপসংহার পর্যালোচনা করে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। জামিল আহমেদ জিয়া হায়দারের নাট্য নিয়ে, চূড়ান্তভাবে দুটো সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। এই সিদ্ধান্ত টানার পেছনে, আমি আগেই উল্লেখ করেছি, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কার হিসেবে জামিল আহমেদ, কালচারাল মেটেরিয়ালিজম এবং নিউ হিস্টরিসিজম– এই দুয়ের সংশ্লেষে তার বিশ্লেষণ-পদ্ধতি নির্মাণ করেন। এর ফলে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ও রাষ্ট্রক্ষমতার সঙ্গে সাংস্কৃতিক আঙ্গিক হিসেবে নাট্যকলার সম্পর্ক কী– সেই অনুসন্ধান জিয়া হায়দারের নাট্যপাঠেও মুখ্য হয়ে উঠেছে। এ কারণেই তিনি উপসংহারে বলছেন, "১৯৬৮ সালে জিয়া হায়দার যখন মার্কিন মুলুক হতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন, [...] তখন বাংলাদেশের রাজনৈতিক

অঙ্গন উত্তপ্ত এবং বিস্ফোরণোন্মুখ (পৃ. ৫৮)। কারণ, ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবসহ দেড় হাজার বাঙালি কারাগারে বন্দি, ১৯৬৯ সালে হয় গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামীলীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ এবং প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়– "এই উত্তাল সময়ের কোনো চিহ্ন" জিয়া হায়দারের নাট্যরচনায় নাই বলেই জামিল আহমেদের মনে হয়েছে (পৃ. ৫৯)। তাঁর মতে, "১৯৬৮ হতে ১৯৭০ সাল অবধি জিয়া হায়দারের শিল্প সংক্রান্ত ধারণা ছিল একেবারেই অরাজনৈতিক (পৃ. ৫৯)। তবে তাঁর পাঠ থেকে আমরা জানছি যে, "মুক্তিযুদ্ধ জিয়া হায়দারের আদর্শগত মানসভূমে এক 'টেকটনিক শিফট' [ঘটায়। এর ফলে] ১৯৭১ হতে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত দশ বছরে জিয়া হায়দারকৃত সাতটি নাট্যের ছয়টি, এবং ১৯৮০ পরবর্তী ছাব্বিশ বছরে দুইটি নাট্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যজাত (পৃ. ৬০)।

জামিল আহমেদকৃত পাঠের সারাৎসার অনুযায়ী বলা যায় যে, ১৯৭২ সালে রচিত *সাদা গোলাপে আগুন* বীরাঙ্গনাদের স্বীকৃতি জ্ঞাপনের লক্ষ্যে তৎকালীন সরকারের রেডিক্যাল সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপক নাট্য। ১৯৭৩ সালে রচিত *পংকজ বিভাস* বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে বীরাঙ্গনাদের যথার্থ মর্যাদা দিতে না পারা এবং রাজাকারদের সমূলে উৎখাত করতে ব্যর্থতার কারণে। ১৯৭৫ সালের মে-জুন মাসে রচিত *এলেবেলে* নাট্য সকল স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে সতর্কতা জ্ঞাপন করে। কারণ "অবিবেচনাপ্রসূত ডিক্টেটরশিপ পরিণামে বিপর্যয়ই এনে দেয়, এমন বক্তব্য কেবল শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে নয়, বরং বাংলাদেশের সকল স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে" (পৃ. ৬১)।

১৯৭৯-৮০ সালে রচিত সময়কালে রচিত *উন্মাদ সাক্ষাৎকার* নাট্য বলে: "মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী শক্তি সমূলে উৎপাটিত না হলে, বারংবার এই গোষ্ঠী দেশ ওর রাষ্ট্রের ক্ষতি সাধনে লিপ্ত থাকবে। (পৃ. ৬১)। "শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের" পরবর্তী সময়ে, ১৯৭৯-৮০ সালেই রচিত *মুক্তি মুক্তি* নাট্য "মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট (পৃ. ৬১)। ৯০'এর গণ-অভ্যুত্থানে স্বৈরাচারী এরশাদের পতনের পর, নিরপেক্ষ নির্বাচনে বিএনপি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী শক্তির যে ক্ষমতায়ন ঘটে সেই প্রেক্ষাপটে, ১৯৯২ সালে রচিত *শ্যামলী চৌধুরীর কথা* নাট্য একাত্তরের শহীদদের তাচ্ছিল্য ও অপমানের জন্য ঘৃণা ছুঁড়ে দেয় বাংলাদেশের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী, অদূরদর্শী ও অশিক্ষিত রাজনীতিবিদ এবং আপামর দর্শকের প্রতি" (পৃ. ৬১)। *চৌর্যপদ* নাট্য যা ২০০৬ সালের পূর্বে লেখা তা ১৯৮০'র দশকের সেনা সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলে ধরে। জামিল আহমেদ মনে করেন জিয়া হায়দারের "এই সাতটি নাট্যের উৎস ইউরো-মার্কিন নাট্য ঐতিহ্য হলেও নিবেদিত স্বদেশ ভূমির প্রতি" (পৃ. ৬১)। তথাপি, জিয়া হায়দারের রাজনৈতিক চেতনা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবাদী মতবাদ ছাপিয়ে যেতে পারেনি বিধায় জামিল আহমেদ তুলনা টেনে বলেন, "[জিয়া হায়দারের] নাট্যকর্ম এবং মামুনুর রশীদ ও এসএম সোলায়মান রচিত নাট্যকর্মের প্রভেদ বিস্তর" (পৃ. ৬০)। এই সূত্রে, জামিল আহমেদের তুলনার

প্রতিতুলনা করে আমি বলতে চাই, ঠিক একই কারণে, সাঈদ আহমদ এবং সৈয়দ শামসুল হক-এর নাট্যকর্মের সঙ্গে জিয়া হায়দারের নাট্যকর্মের বিস্তর অভেদ রয়েছে।

জামিল আহমেদ তাঁর এই প্রবন্ধে জিয়া হায়দারের আদর্শগত মানসভূমের টেকটনিক পরিবর্তন চিহ্নিত করেছেন 'রাজনৈতিক' প্রত্যয় দিয়ে। তাঁর "এই প্রবন্ধে 'রাজনীতি' প্রত্যয়ের অর্থ নির্দেশ করে রাষ্ট্র শাসন ও রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি এবং এ বিষয়ে চিন্তন, অনুধ্যান, পক্ষ অবলম্বন ও সমালোচনা" (পৃ. ৬০)। তিনি এই সংজ্ঞা গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রবাদী ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু আমরা তো এটাও জানি, মানুষের সকল কর্মকাণ্ড যা যে কোনো প্রকার ক্ষমতার উৎপাদন, বণ্টন, বিরোধিতা ও চর্চার সঙ্গে জড়িত তা-ই রাজনীতি। আরও সুনির্দিষ্টভাবে, মার্ক্সিস্ট তাত্ত্বিক ও ইতালীয় রাজনীতিক আন্তোনিও গ্রামশি অনুসরণ করে বলা যায়, জামিল আহমেদ কেবল পলিটিকাল সোসাইটির কাজ এবং সেই কাজ নিয়ে সিভিল সোসাইটির কাজকর্মকে রাজনীতি বলে রাজনীতির বহুবিধ অভিব্যক্তিকে উপেক্ষা করেছেন। এই কারণেই জামিল আহমেদ বলতে পেরেছেন, "[১৯৬৮ থেকে ১৯৭০ সাল অবধি জিয়া হায়দারের] দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সম্পূর্ণরূপে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের নাট্যজগতের প্রতি, উদ্দেশ্য ছিল *বৌদির বিয়ে*, *কুয়াশার কান্না* ইত্যাদি সামাজিক মেলোড্রামা হতে স্বদেশভূমিকে মুক্ত করে সমকালীন বিশ্বনাট্যের সঙ্গে স্বদেশের পরিচয় ঘটানো" (পৃ. ৫৯)। সেই সময়কার রাষ্ট্র-ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনৈতিক পটভূমিতে জিয়া হায়দারের এই কর্মগুলিকে জামিল আহমেদ বলেন "সঙ্গতিহীন, তালভ্রষ্ট" (পৃ. ৫৯)। আমি বলতে চাই, জামিল আহমেদ এই সিদ্ধান্ত দেবার ক্ষেত্রে রাজনীতির ব্যাপক অভিব্যক্তি এড়িয়ে গেছেন। জামিল আহমেদের এই বিশ্লেষণ যেটা আড়াল করে তা হলো সংস্কৃতির রাজনীতি। রাজনীতির যেমন সংস্কৃতি আছে, তেমনি সংস্কৃতিরও রাজনীতি আছে। সিভিল সোসাইটির উপাদান হিসেবে যে কোনো নতুনত্ব অনুসন্ধানী লেখক-শিল্পী মাত্রই সৌন্দর্যের নতুন ভাষা সৃষ্টির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক রাজনীতির লড়াইয়েই লিপ্ত থাকেন। এই ভাবনাসূত্রে, সৈয়দ জামিল আহমেদের বিপরীতে দাঁড়িয়ে, বলতে চাই, ১৯৬৮ থেকে ১৯৭০ সাল অবধি আধুনিক শিল্পী হিসেবে জিয়া হায়দার নাট্য নিরীক্ষা ও নতুনত্বের উদ্বোধনের সৃষ্টিশীল কাজে নিমজ্জিত থেকে নান্দনিকতার তথা সাংস্কৃতিকতার রাজনীতির ভাষা-ই সবলে সৃষ্টি করতে মগ্ন ছিলেন।

তবে শেষ করার আগে, আবারও মনে করতে চাই বোর্হেসের সেই কথা– এভরি রাইটার ক্রিয়েটস হিস ওউন প্রিকারসর্স। আমার এই লেখার জন্য দরকার ছিল সৈয়দ জামিল আহমেদকে। আর জামিল আহমেদের লেখার জন্য দরকার ছিল জিয়া হায়দারকে। আর জিয়া হায়দারের লেখার জন্য দরকার ছিল এই পৃথিবীতে তাঁর একটি জীবন। সেই জীবনই তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে এইসব সত্যসন্ধানী নাট্য। নিঃসন্দেহে জিয়া হায়দারের জীবন সার্থক জীবন।

সহায়কপঞ্জি

আরিফ হায়দার [সম্পা.] (২০২০)। 'সম্পাদকীয়'। *নাটকসমগ্র* ১ ও ২। জিয়া হায়দার, ঢাকা: নালন্দা, ২০২০।

জামিল আহমেদ, সৈয়দ (২০২০)। 'জিয়া হায়দারঃ অগ্রজ পথিক, অগ্রীয় পথিক'। *নাটকসমগ্র* ১ ও ২, জিয়া হায়দার। নালন্দা প্রকাশনী, পৃপৃ. ১১–৬৮

জিয়া হায়দার। (২০২০)। *নাটকসমগ্র* ১ ও ২। নালন্দা প্রকাশনী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৮৩)। 'আমি'। *শ্যামলী*, *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (তৃতীয় খণ্ড)। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃপৃ. ৩৯২–৩৯৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (১৯৯৯)। *মানুষের ধর্ম*। মাওলা ব্রাদার্স।

শাহমান মৈশান (২০২২)। 'বাংলাদেশের শিব-সমালোচনায় চিহ্নিত আধুনিকতার খোঁজে নান্দনিকতার নীতি পর্যালোচনা'। *রাজশাহী ইউনিভারসিটি জার্নাল অব আর্টস এন্ড ল*, বর্ষ ৫০, পৃপৃ. ১২১–৩৪

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। (১৯৩৪)। *প্রণীত বঙ্গীয় শব্দকোষ*। বিশ্বকোষ প্রেস।

Abbott, H. P. (2002). *The Cambridge introduction to narrative*. Cambridge University Press.

Balibar, É., & Macherey, P. (1996). On literature as an ideological form (1974). In T. Eagleton & D. Milne (Eds.), *Marxist literary theory* (I. McLeod, J. Whitehead, & A. Wordsworth, Trans.; pp. 275–295). Blackwell Publishers.

Burke, Sean. *The Death and Return of the Author: Criticism and Subjectivity in Barthes, Foucault and Derrida* 2nd ed, Edinburgh University Press, 1995.

Crotty, M. (1998). *The foundations of social research: Meaning and perspective in the research process*. SAGE Publications.

Dhanañjaya. (1969). *The Daśarūpaka of Dhanaṃjaya with the commentary Avaloka by Dhanika and the sub-commentary Laghuṭīkā by Bhaṭṭanṛsiṃha* (T. Venkatacharya, Ed.). The Adyar Library and Research Centre. (Original work published 1941).

Foucault, M. (1970). *The order of things: An archaeology of the human sciences* (A. Sheridan, Trans.). Tavistock Publications.

Holderness, G. (2014). *Tales from Shakespeare: Creative Collisions.* Cambridge University Press.

Marx, K., & Engels, F. (1947). *The German ideology* (C. J. Arthur, Ed.). International Publishers. (Original work written in 1846).

Pym, A. (2009). *Exploring Translation Theories*. Routledge.

Rao, S. (2017, November 22). Concerning the Dasarupa of Dhananjaya. Sreenivasarao's blogs. https://sreenivasaraos.com/2017/11/22/concerning-the-dasarupa-of-dhananjaya/

Slaughter, C. (1980). *Marxism, Ideology & Literature*. The Macmillan Press.

Spivak, G. C. (1993). *Outside in the Teaching Machine*. Routledge.

Wright, E. (1995). *Psychoanalytic Criticism: A Reappraisal* (2nd ed.). Polity Press.